সূচিপত্র

১

গভীর সূর্যাস্ত থেকে উঠে আসে যারা— গাঢ় চোখ—
দীর্ঘ চুল— বোতামে গোলাপ— যারা বিয়োগনাট্যের
রূপবান কুশীলব, তাদের উৎসর্গ করে লেখা
পদ্যপংক্তিগুলি ফুলমঞ্জরির মতো ঝরে গেছে।
এখন কাগজ ভরে সমিল মঞ্চের ঘোর দাবি।
চোখা নিবে ফুটে ওঠে ফুলঝুরি-ওড়ানো কুশীলব।
তবু কেন গভীর গভীরতর মসীর পাতাল
ফুঁড়ে জেগে ওঠে দুঃখ, ভাঁড়ের আলখাল্লা ভরে যায়
শুদ্ধ রক্তপাতে, আমি বুঝতে পারি না। চোখে দেখি
সারি সারি নিঃসঙ্গতা গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে আসে
দরাজ ময়দানে— তারা হেঁটে যায় বিশাল দুপুরে
প্রতি রৌদ্রকণা বয়ে, প্রতি তৃণকণা পায়ে পিষে
তারা লীন হয়ে যায় কাগজে আমার— তারা কেউ
সুখী না, দুঃখীও নয়,— তারা শুধু ঢেউ, শুধু ঢেউ।

২

একদিন আমায় আমার অগোচরে নিয়ে গেছ : যে জীবন
জমা আছে তোমার ভিতরে, একই সাথে বাহিরের
দৃশ্যে দৃশ্যে, একদিন সেই সম্মোহের ইন্দ্রজাল
টাঙিয়ে রেখেছ তুমি শুধু ওই শাণের রোয়াকে।
তুমি কি পণ্যের চেয়ে স্পৃশ্য নও? তবে কেন দ্রুত
নিজেকে আড়াল করো যুবতীর চোলির আড়ালে?
শুধু পুকুরের ঢেউ, ডুমুরপাতার প্রদোষিকা
আমার দেরাজে পুরে রেখে গেছ। টাকার বদলে
শব্দ করে বাজে শুধু লঘুভার, অথচ দুর্ভার
জীবনের নানাবিধ ত্রিকোণ চতুষ্ক রূপরেখা।
কী জানি তাদের ভাষা কতখানি অভিব্যক্তিবাদী!
আমি শুধু জীবন-জীবন ভেবে তাদের বদলে
অস্পৃশ্য রহস্য দিয়ে জুড়েছি সমস্ত ঘরখানা।
আলাদা পা রাখি এতটুকুও প্রহর বাকি নেই।

৩

জমা আছি তোমার খাতাতে। শুধু খরচের বেলা
একবার মনে ক'রো বালি-ওড়া হাওয়ার বিকেল
সবার মুঠির থেকে অগোচরে ঝরে গিয়েছিল :
সেই দৃশ্য ; মনে ক'রো তোমার খাতায় কুঁদে রাখা
অক্ষর জমার অঙ্ক বহুদিন আগেই তোমার
তবিল নিঃশেষ করে উড়ে গেছে। শরতের মেঘে
হেমন্তের জমা কুয়াশায় স্তূপ হয়ে থাকা যত
মধুর কাহিনী—সব একদিন তোমারই খাতার
নিপুণ হিসেবে মূর্ত হয়ে ছিল। যদি ভেবে থাকো
ওরা সব এখনো অমনই সদ্য মাটির সোঁদালি
গায়ে মেখে আছে, যদি ভেবে থাকো তোমার খাতায়
যত কিছু তোলা সবই নক্ষত্রের রৌপ্য সৌজন্যের
শাশ্বত উদ্ভাস গায়ে জ্বেলে আছে, ক্ষতি নেই, শুধু
আমায় বরাদ্দ ক'রো ওরই থেকে এক কণা বিভ্রম।

৪

হে প্লুত বাদল, তুমি কোন রাস্তা ধরে ছুটে আসো-
রোদ্দুর ঝিকিয়ে থাকা নগরবসতি ম্লান করে,
বুক-উপচে-ওঠা কালো গোলাপশিহর অকাতরে
সিক্ত করে দিয়ে দ্রুত চলে যাও, আর আত্মহারা
এখানে সেখানে মাটি ভিন্ন করে রুপোলি ফোয়ারা
তোমার পিছনে ধাওয়া করে যায়— তুমি অনাদরে
যত শুকনো অভিমান ফেলে গেছ তাদের সবার
জলরেখাহীন শূন্য ফোয়ারার স্বপ্ন-সোমধারা
তোমার পিছনে ধাওয়া করে যায়— হে প্লুত বাদল
তুমি আমাকেও উপচীয়মান আকাশগঙ্গার
পুণ্যধারাজলে ভোর করে দেবে বলেছ, তুমি যে
এক-মাঠ শ্রাবণের স্তোক দিয়ে আমাকেও মিছে
ভুলিয়ে গিয়েছ, আর পিঁপুলতলায় একলহমা
নকশি চাদরের মতো তোমার সানন্দ শ্রমজল
ফেলে রেখে গেছ, সেই পরদ্রব্য আমায় সচ্ছল
করে যেতে গিয়ে রেখে গেছে শুধু বিমর্ষ সুষমা।

৫

রক্তকরবীর ডালে অনঙ্গের মাণিক্যমঞ্জুষা
একদিন হঠাৎ ছড়িয়ে গেল। যারা ছিল নীচে,
যারা দূরে ছিল, যারা ঘরের সুখোষ্ণ আঁচে প্লুত
হয়ে ছিল, সেই শিষ্টজনেরাও দস্যুর মতন
এসে ডাল উজাড় করে নিয়ে গেল। আমারও তাবিজে
ছু-একটি পরাগচূর্ণ বোধহয় বেঁধেছি : সন্ধ্যাবেলা
পাটল মেঘের কোলে একদিন মকরলাঞ্ছন
দীপিত হৃদয় খুব শাস্ত উড়ে যেতে দেখে দ্রুত
তোমার কপাটে ফিরেছিলাম। বিশ্বের অবহেলা
নীল বরিহায় রোমাঞ্চিত হতে দেখে অভিভূত
লেগেছিল আমারও অচিরে! আর সেই যে মদন—
যাঁর প্রতাপের শেষ নেই, যাঁর চূড়ার টালনি
অবধি কবিরা লিখে গেছেন সম্ভ্রমে, তিনি নিজে
আমায় নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে এলেন তখনই।

৬

এক রাতে ঈশ্বরীর মতো এসে সর্বস্ব আমার
রাজকর বলে কেড়ে নিয়েছিলে। এক রাতে আমার
সারাজীবনের দিনরাত্রিগুলি অক্লেশে ছিনিয়ে
লহমা যাবার আগে হারিয়ে গিয়েছ। সারা রাত
চারিভিতে জ্বলে যায় রূপসী আগুন—সারা রাত
বাহুল্যা নাচুনী নাচে—বিবৃত দু-পায়ে
থাকে বাসি ফুল, সারা রাত ধরে তবলার লহরা
হেরে যায়—সারা রাত তদ্গত সারেঙ্গী অধোমুখে
—মাধবী—মাধবী—বলে কেঁপে কেঁপে ওঠে, সারা রাত
দপ্‌দপে রগের মধ্যে—মাধবী—মাধবী—কেন তুমি—
কেন ভালোবাসো না আমায়—বলে সারা ব্রহ্মাণ্ডের
ছন্দ আর্তনাদ করে ওঠে, আর বাহুল্যা নাচুনী
জলদ কণ্ঠকে তোলে স্ফুলিঙ্গ, তারপর লহমায়
ঈশ্বরীর মতো সে হারিয়ে গেছে সারা দৃশ্য থেকে।

৭

সবুজ বর্ষায় ঐ রোমাঞ্চিত লেবুর জঙ্গলে
একটি দুর্বোধ গন্ধ তরঙ্গিত হয়, পুরাতন—
বড় পুরাতন দুঃখ হৃদয় মাতাল করে তোলে,
বড় পুরাতন সুখ নিমেষে হৃদয় উচাটন
করে দেয়, ঘাসফড়িঙের নোনা আলস্য, ঘুঘু-র
ভিজে পালকের হর্ষ, সুদূরান্ত মেঘমলিনতা—
দু-হাতে ফুসফুস ধরে ঝাঁকে, আর নিমেষে নিমেষে
শাঙন ঝরিয়া যায় অবেলায়, বুঁদ হয়ে ভেজে
আতুল হৃদয়, তার খানে খানে লেবুকাঁটা বিঁধে
রক্তকরবীর নকশা ফুটে ওঠে, সব সফলতা
সব ভাগ্য সব সুখ একদণ্ড করে সে মঞ্জুর
অকৃপণ হাতে, আর পরক্ষণে কাচের মতন
ভেঙে ফেলে, একবার ধারাজলে রভসবিধুর
করে সে, তখনই লেখে তীব্র ক্ষতি জীবনচরিতে।

৮

আমার বাসনা ভেসে গেছে সব তোমার উদ্দেশে—
নিঃশব্দ আবেগে ঝিলিমিলি ওঠে রৌদ্ররাত্রি ভরে ;
কামিনিসুরভি বয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ছোটে রাঙা পথ ;
সমস্ত স্রোতের শীর্ষে ফেনা ভাঙে আমার অঞ্জলি।
নিঃশব্দ আহ্বানে আমি জর্জর, তোমার দেহচ্ছবি
ঘটের প্রতীকে বাঁধি : জিভে ওঠে নোনা রক্তস্বাদ
কয়টি অস্ফুট শব্দ, শূন্য কেড়ে নিয়ে যায় দ্রুত।
কেবল আমার থাকে দেহে গাঁথা হৃদয়স্পন্দন।
ধুলো উড়ে পড়ে চোখে। কেন অকারণে পথ বাঁধো ?
ফুলেরও জীবন বড় অসহায়, বড় ত্বরান্বিত !
তোমায় সাজিয়ে আমি পুঁথি ভরে বিলাসী কবিতা
লিখতে পারি না, শুধু নিঃশব্দে তোমার নাম ডেকে
ডুবে যেতে পারি পথচিহ্নহীন ধুলোয় নিমেষে।
আমার বাসনা তবু ভেসে যায় তোমারই উদ্দেশে—

আবার প্রণীত হতে চাই— বলে একত্রে সবাই
ঘিরে এলো : স্মৃতি নেচে ওঠে, সব মহার্ঘ খরচ
কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে পলাশপরাগে।
থালায় সাজানো রঙ, আঙুলে লঘুতা। সুবচনী
চাঁদ পাখা গুটিয়ে নেমেছে এসে জঙ্গলের ফাঁকে
সন্তর্পণে, ঘোর লেগে কল্‌মল্ করে ওঠে চখাচখি।
স্মৃতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে : কাকে তুলে নেবে? চারিদিকে
রাশি রাশি শাদা পাখ ফেলে গেছে হাঁস। পায়ে পায়ে
বাঁধে বুনোলতা, গুঁড়ো হয়ে যায় ইঁদুরমাটির
খারিজ-সঞ্চয়। আমি নিজেকে তুলে নি তলা থেকে,
মৃত টুকরোগুলো বেঁধে জড়িয়ে দি জ্যোৎস্নার উড়ুনি।
স্মৃতি ধর্না দিয়ে আছে ভক্ত্যাবেশে কান্তারবাসিনী
রাত্রির দেউলে। সব একত্তরে জুটেছি তার কাছে—
শুধু আরেকবার পুনঃপ্রণীত হবার আশা নিয়ে।

মুছে যাও আপাতত : চৈত্ররথপুরের রক্তাশোকে
ছাওয়া বনস্থলী, ঐ রজতোর্মি ছাওয়া রতিকুশা
তাম্রপর্ণী নদী : শূন্য হয়ে যাও, এখন আমার
রূপসী নিসর্গে ঘুরে আসার মতন সুখ নেই।
তুমি স্থির থাকো রাজশেখরের দশম অধ্যায়ে।
একদিন প্রাকৃতভাষিণী নাগরিকাদের সমভিব্যাহারে
তোমার ঐ লতাকুঞ্জে বসে চারিধারের বর্ণালি থেকে রঙ,
দৃশ্য থেকে ধ্বনি, নারীদেহ থেকে কান্তি আহরণ
করে নিয়ে প্রিয়ঙ্গুফুলের তুল্য সুন্দরীতমার দীপ্ত শ্যাম স্তনযুগলে সাজিয়ে
দেবো, একদিন সাতবাহনের কবিতাসভার
তাড়ঙ্ক ও জয়পত্র জিনে সব নগরবেশ্যার পদতলে
নামিয়ে— ভৃঙ্গার ভরা রূপ ও মাধ্বীক বিনিময়ে
এক রজনীর জন্য যেচে নেব। একদিন নিশ্চয়
আমারও সময় হবে, শুধু আজ শুধুমাত্র আজ
এমন সম্বল নেই তোমায় নিয়াসি ঘরে তুলে।

১১

যখন সবাই সুখে রাত্রি যাপে, অঘোর রাত্রির
নীলিমা নিজেই এসে শুয়েছে বিবশ মাঠে-ঘাটে
তখনো তোমার নভে সূর্য পোড়ে সহস্র ঈর্ষায়,
বাগানের দগ্ধ ঘাসে নিঃশঙ্ক সংসার পাতে সাপ।
যতখানি দৃষ্টি চলে নতদীপ হর্ম্যের জানালা,
নীচে নিশি-পাওয়া পথ— সব যেন হঠাৎ তোমারই
দুঃস্বপ্নের আঁচে চোখ রগড়ে উঠে বসেছে। তুমি সেই
মিশকালো ডালপালা ঢেকে বুকে রেখেছিলে চুপিসাড়ে
জ্যোৎস্নার হীরক, তার অলৌকিক দ্যুতি এখনই কি
মিথ্যা করে দিয়ে গেছে আঁধার-উগরানো চুল্লিগুলো!
অঘোর রাত্রির নীল ভ্রমিভঙ্গে তুমিও হঠাৎ
নিজের মুখ চেয়ে চমকে ওঠো! —জানতে পারোনি তোমার
কবে পাল্টে গেছে ছোটবেলাকার মুখ অজানিতে,
রাত্রির দহনে পুড়ে দু-হাত আঙার হয়ে গেছে!

১২

একদিন বেলাবেলি রুপালি বন্দরে পাটাতন
ঠেকে যায় : ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরে এসেছে নাওয়ারা।
সমুদ্রঢেউয়ের পাড় লক্ষ্য করে আছাড়বিছাড়—
বালির শিরশির উল্টো পথে ঠেলে— প্রগল্‌ভ হাটের
বিপরীত ঝাউয়ের প্রান্তর পার হয়ে ঘন ঘাস,
স্থির চেয়ে রয়েছে অপ্সরাকুল গোলাপডাঁটায়।
কোনো অজুহাত নেই, ফেনার ফসিল ফেরি করি,
একটু জল চাই— সিন্ধুফেরত মাল্লার তৃষ্ণা নিয়ে!
জলের চেয়েও তীব্র হাসির প্রবল উচ্চরোলে
দশখানা হয়ে যাই, ঝিনুক ছড়িয়ে যায় ভুঁয়ে।
তারা কিছু আমল দেয় না, তারা সোজাসুজি বেঁধে
তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে, বলে 'ভিতরে তাকাও'— ভিতরে যে
শুধু অন্ধকার শুধু বারদরিয়ার অন্ধকার,
সে কথা বুঝেও তারা মাঝির সাহসে বেয়ে যায়···

প্রথিতযশার মতো নেমে এলে : মেঘ ঢলে থাকা
বনের রাস্তায়, চোখে ছলনার গাঢ় কালি-টানা
ঈশ্বরী আমার, তরুবল্লরি সোমাদ্র´— পায়ে পায়ে
ছলকানো মহুয়া, মুক্ত বাহুতে আদিমতর মদ—
বহুপ্রজাবতী ধরিত্রীরে তার কুমারীবেলার
সখিতা মনে করিয়ে দিলে তারপর— যেন কেউ
তোমাদের মধ্যে নেই, যেন ঐ নিভৃত অন্দরে
সূর্য বা মানুষ কারো প্রবেশাধিকার নেই, শুধু
ছোটবেলাকার কীর্ণ মাধুরি লেগেছে, তারই বশে
আমায় তোমার কুণ্ঠা নেই, তুমি জানো না আমার
নকশি চাদরের নীচে সবুজ কালসিটে ধরে আছে—
ঘনযামিনীর বিষদ্রাক্ষাভার বুকের তলায়
ধরে আছে— তুমি তার কিছুই জানো না, তুমি তার
কিছুই না জেনে শুধু কবেকার পুরোনো স্বভাবে
আমায় একটু সুখ দিতে এসে ঢাকা বুক থেকে
কালো পুঞ্জীভূত রক্ত শুষে নাও, বাঙ্ময়ী কবিতা !

১৪

চারিদিকে সাজানো ঘরদোর, সোজা মাথার উপরে
অলিন্দের বালা— সারা পথখানা আলো করে বসে।
সারা পথ পুড়ে যায় : ওগো মেয়ে, একবার তোমার
ঐ নম্র রাঙা আঁচে পুড়ে যেতে দাও ! সে কারোকে
ডাকে না, কেবল আরো স্থির হয়ে দিগন্তে তাকিয়ে
বসে থাকে। —ওগো মেয়ে তোমার ঐ নিস্পৃহ নখরে
রক্তে ভরে গিয়েছে আমার ইচ্ছেগুলি, শুধু সেই
বাসনাগুলিকে তুমি তোমার নিজের করে নাও !
চুলে সন্ধ্যা গাঢ় করে ঢেলে আরো দূর হয়ে ওঠে
অলিন্দের বালা। —ওগো মেয়ে, তুমি বরং আমায়
প্রত্যাখ্যান করো। কেন আমাদের শব্দের মণ্ডপে
দেবীর বেদীতে অধিরূঢ়া হতে চাও ? আমাদের
চুমার চেয়ে কি রমণীয়তর বিল্বপত্র-ফুল ?
তাকে চেয়ে হা-হা করে ওঠে নীচে পথের কাঁকর…

১৫

দেখেছি রুপোবাহিনী নদীজলে পানসি-ছুট তমিস্রা একদিন
গাঢ় রাত্রিবেলা এক শষ্প-ছাওয়া গ্রাম্য তীর ঘেঁষে
নামিয়ে দিয়েছে সব গুরুভার মনস্তাপগুলি।
বৃষ্টির কণার সাথে ভেসে আসে গতাসু সময়।
পোড়া স্মৃতিখণ্ডগুলি আলেয়ার মতো কাঁপে। কেবলই অতীত
স্তূপ হয়ে জমে ওঠে আমাদের ভাষার ভাণ্ডারে।
কারো ভারসাম্য নেই— নদী-গিরি-বৃক্ষ— কারো, তবু
বেঁচে আছে, যেমন দেহের মধ্যে আমরা এখনো
অনায়াসে বেঁচে— শুধু মাঝে মাঝে রতি ও বাখরে
গাঁজিয়ে তুলেছি শতরঞ্জী আলো। কারোকে চিনি না,
চিনি বিছানার তাত, চিনি খাঁ-খাঁ মাঝরাত্রিবেলা—
যখন একলা উঠে যেতে পারি নিজেকে ছাড়িয়ে!
সবই ডুবে গেছে ওই তমিস্রায়, বদলে আমায়
হাতে দিয়ে গেছে অফুরন্ত দাহ— রূপকে শমিত।

কারো দিকে তাকানো বারণ নয়। কেউ নীলিমার
সর ছেনে সারাদেহে মাখে, কেউ সন্ধ্যার নির্জনে
প্রতিটি নীলিমা ঝরে যেতে দেখে। অসংখ্য বাতাস
দিগ্বলয় ঝেঁপে আসে গৃহাতুর কাকের পাখসাটে।
যেহেতু সবার দিকে অবাধে তাকানো যায়, আর
যেহেতু সবার ক্ষীণ চোয়াল ও স্পর্ধিত ললাটে
বাসনা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞান, বুকের স্পন্দনে
নির্জিত স্নায়ুর ক্ষোভ ওঠে পড়ে, যেহেতু সন্ত্রাস
দিব্যানুভূতির মতো বুকের তলায় বারোমাস
শুয়ে থাকে সকলের, তাই অতি নিশ্চিন্তে সবার
চোখে চোখ রাখা যায়, অতি অনায়াসে মনে মনে
সারা বসুধার শাপে হৃষ্ট হয়ে, সারা বসুধার
অনন্ত দুর্ভাগ্য মেনে— ছাইওড়া হতশ্রী মাঠে মাঠে
একটি অমল পাপ রোয়া যায় শোণিতসিঞ্চনে।

১৭

দিন সান্দ্র হয়ে ওঠে, খুব নিরাবেগভাবে তখনো
গুটোনো ফিতের থেকে কালো পথ খুলে খুলে আসে…
চুল আঁচড়াতে ক্লান্তি, এত ঘোর রয়েছে শরীরে—
দেখি ছায়া দৃষ্টিহীন চেয়ে আছে— পানের দোকানে—
সারি সারি লেমোনেডে বাসি ঘোলা ক্লান্তি ভব্য সেজে
দৃষ্টিহীন চেয়ে আছে! শুধু জল ভেঙে এক দল
উঠে এলো যেন নীল রম্যরচনার পৃষ্ঠা থেকে—
বয়ে গেল কলস্বরে স্রোতল কবিতা, সারা গায়ে
দীপ্ত বাতিদান হয়ে জ্বলে শব্দশ্লেষ, অর্থভূষা!
—সব আমাদের পিঠে! টের পাই, দেখতে পাই না।
পকেট হাতড়াতে গিয়ে খুচরো বেজে ওঠে নখে নখে,
পকেট হাতড়াতে গিয়ে উঠে আসে ছেঁড়া খাম ধরে
ময়লা, শতভাঁজ, স্তব্ধ সতেরো বছর : কালি মাড়া
সর্বাঙ্গ, মুখখানা শুধু রক্ত ঢালা মূক প্রতিবাদে।

১৮

লেগেছে সূর্যের শাপ— ভাঁজে ভাঁজে তিক্ত ঘাম পোড়ে,
সমস্ত শরীরে বড় দৈন্য, খোলা বুকে এসে লাগে
মধ্যদিবসের আঁচ। গলা উঁচু করে নভোনীড়
ছুঁয়ে আসে ট্রানজিস্টরের তীক্ষ্ণ এরিয়েল : স্বর্গের কর্দম
ছুঁড়ে দিয়ে যায় খোলা বুকে। শিস্— হর্‌রার উল্লাস—
শোভাযাত্রা করে চলে··· তোমার সদর দরোজা কি
ভেঙে গেছে ? না কি তুমি আয়নালাগা পানের দোকান
বসিয়েছ ! —মাননীয় মূকাভিনেতার মতো ভাঁড়
কাত করে ঢেলে দিলে রক্তিম পানীয় সারা গায়ে।
তোমাদের মুশকিল আসান হয়ে আছে জানি ঐ
কাঠের বারান্দাওলা দোতলায়— গলির ভিতরে।
হাজার বেলুন ওড়ে ছাদ থেকে, তোমার পোশাকী
আলখাল্লা বেয়ে পড়ে পানের কষের তৃপ্তিরস···
দাঁড়াও আমার সামনে স্বয়ম্ সত্যের রাজবেশে।

১৯

চোখে রুটো জ্বালা, তীক্ষ্ণ সিঁদুরে তারার চারিধারে
চাপ চাপ রাত্রি— নেমে দাঁড়িয়েছে উঠোন-ভরাট।
সত্যকে এড়িয়ে বেছে নিয়েছ ঘুমের নিরাপদ
কক্ষ, কেউ দেখতে আসো নি মাতৃজঠরের মতো
রাত্রি-গর্ভে ডুবে গেছি নিষ্ক্রম না জেনে, নিঃসহায়ে।
সত্য কি অমন? শুধু রাত্রি জেগে কিনে নেওয়া যায়?
কেবল শরীর ভরে কটু তেতো বিস্বাদ জাগিয়ে
দেখতে পেয়েছি চরাচর-জোড়া ব্রণাঙ্কিত রাত
জ্যোৎস্নার চীবরে দেহ ঢেকে স্থির সুপ্তির ভিতরে
সদ্ধর্ম যাপন করে চলে। আমি অঞ্জলি উন্মুখ
করে চলে গেছি ভয়ঙ্কর সেই নিষুতির মাঝে
ঘর ছেড়ে— তোমাদের পল্লীর পাহারা ছেড়ে, শুধু
আদিগন্ত রাত-ঢেউয়ে ভরে উঠে, সব ছেড়ে ফের
বুক ভরে সব পুনরুপার্জন করে নেব বলে।

২৫

বিকেল ফুরিয়ে যায় স্মৃতিমন্থনের আয়োজনে।
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে স্মৃতিহীন বিষাদের মতো।
আমার কারোকে মনে পড়ে না। শুধু আমার মনে
বিস্মৃতিবিবশ এক সন্ধ্যারাত অখণ্ডমণ্ডল
রচে দেয়। গুঁড়ি গুঁড়ি নক্ষত্র ভিজিয়ে দিয়ে যায়
কাপড়চোপড়, ভিজে চুল বেয়ে ক্লান্ত ধারাজল
ঝরে পড়ে,— আমার কারোকে মনে পড়ে না স্পষ্টত।
শুধু এক তরল নীলিম রাত্রি দেহে ঝুঁকে আসে,
খুব নিরাবেগভাবে বুকে হাত রাখে, চুমু খায়,
আলিঙ্গন করে, ফের ফিরে যায় শিথিল আয়াসে
শুধু শতরঞ্জী এক অন্ধকার দাঁড়ায় শিয়রে,
দুর্বোধ ভাষায় কিছু বলে যায়, তারপরে দ্রুত
ফেরে নভস্তলে। তারা বড় ভয়ানক ঘুমঘোরে
আমায় সারাজীবন রেখে যেতে চায় অভিভূত।

যখন ডাগর বেলা ঝাঁ-ঝাঁ করে কুঁকড়োনো সবুজে,
পিচে লাল ছায়া ছলছলিয়ে কাঁপে, এ-গ্রাম সে-গ্রাম
ভিন্ন করে চলে যাওয়া মোরাম নির্জীব পড়ে থাকে,
মাথার উপর থেকে হলুদ স্বলোপী আচ্ছন্নতা
আমার অটুট বিষাদের পরে উইটিপির মতো
চেপে বসেছিল, আর একবার পথ থেকে নামিয়ে
নহরখালের পাড়ে ধোঁয়াটে শ্যাওড়ার পাশে ঘোলা
হাঁটু-ভর জলে দুটি দেহাতী মেয়ের আলগা গা-য়
সজল অভ্রের বিন্দু বিন্দু জ্বালা আর শীতলতা
দেখিয়ে তাদেরও ছেড়ে চলে গেছে মুহূর্ত দাঁড়িয়ে।
আমি যত চঞ্চল দৃশ্যের জন্য শব্দাবয়বের
আকৃতিতে দীর্ণ হয়ে যাই, সেই খরজ্যৈষ্ঠবেলা
শুধু থেকে থেকে এক গোরুর গাড়ির আর্তনাদ
বাজিয়ে বুকের মধ্যে শ্লথ পায়ে ভিন্ গাঁয়ে চলেছে....

২২

একদিন সুদূর এসে বারান্দায় দাঁড়ালো— নোয়ানো
বিকেল রৌদ্রের বেশে : করপ্রসারের বরাভয়ে
শূন্যতা মাখানো নীলাঞ্জনছায়া, একদিন সুদূর
হূ-হু করে ওঠা গৃহপাদপের নীচে ঘটবারি
পূর্ণ করে তোলা ইতুভাস্করের মতন দাঁড়ালো।
সমস্ত উঠোনে জঞ্জাল ছেয়ে আছে, আলপনার শাদা
সব আশা ধুয়ে ফেলা বিচক্ষণ গৃহস্থের হাতে
সযত্নে সাজানো, আমি কোথায় তোমায় তুলে রাখি!
এক সন্ধ্যেবেলা তুমি পুকুরপাড়ের রাস্তা ধরে
চলে গিয়েছিলে— সঙ্গে আমার সমস্ত স্বপ্নঘোর।
যে মেয়ের লুকোনো উরস বুকে চেপে দীপ্ত ঘুমে
যামিনী গোয়াঁবো বলে ঘন গুলঞ্চের সঙ্গোপনে
দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি তাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে
এখানে গিয়েছ রেখে অধিক খাদ্যের আন্দোলন।

২৩

বেলা চলে যায়, রৌদ্র মাচা থেকে নেমে উঠোনের
গণ্ডি পার হয়ে লাল মোরাম পেরিয়ে চলে যায়—
আকাশ উজাড় করে আরেক দিনের অন্তহীন
কাকের পাখসাট নেমে আসে, আর হা-হা করে ওঠা
ঘরের ভিতরে এক রোগা শাদা মোম জ্বলে ওঠে।
এত বড় রাত আমি কি করে কাটাবো। হাসনুহানা
জটিল গন্ধের মতো রহস্য সেঁধিয়ে রেখে গেছে
চারপায়ার নীচে। আমি সারারাত ধরে মস্ত এক
নিদ্রাহীনতার সাথে যুঝে ক্লান্ত হয়ে অতিকায়
ছায়ার দাক্ষিণ্যে আত্মসমর্পণ করে স্বপ্ন দেখি
প্রতিটি সূর্যের তলে জানু পেতে বসে বসুন্ধরা,
প্রতিটি সূর্যের তীক্ষ্ণ নখাঙ্করাতায় তার বুক
ভেসে গেছে— আমি ঐ রৌদ্রের পিছনে তীব্র ক্ষোভে
ঢের ছুটে গেছি আর ঘরে নিয়েসেছি তার শাপ—

সন্ধ্যায় কোথায় থাকো : যখন আকাশ প্রাক্‌পূর্ণিমা
সমস্ত গা ভরে ঢেলে রাখে, মস্ত চন্দ্রমল্লিকার
হারমণিখানি তার গলায় অলোকদ্যুতি নিয়ে
ধীরে ধীরে দোলে, আর কাঠকুড়ানীরা দ্রুতক্ষেপে
দুটি স্তন ভরে জ্যোৎস্না নিয়ে যায়— সেই সন্ধ্যাবেলা।
তোমার কি এত জ্যোৎস্না তোরঙ্গে সঞ্চিত আছে ? — তুমি
নিজের বুকের সব আকূতি অগ্রাহ্য করে একা
ঘরে বসে থাকো ; তুমি বনের চন্দ্রাক্ত গাছপালায়
হারিয়ে না গিয়ে তুমি রাস্তার রুপালি স্রোতোধারে
বেরিয়ে না এসে একা বিন্দু বিন্দু আঁধারবর্ষণে
ভিজে যাও, তুমি অতি-অকারণ পাড়ের নকশায়
বুঁদ হয়ে থাকো, — আর কাঠকুড়ানীরা দ্রুতক্ষেপে
দুটি স্তন ভরে জ্যোৎস্না নিয়ে যায় তাদের কুটীরে :
যে কুটীরসার তুমি নৃতত্ত্ব-নিবন্ধে ঢের দেখেছো।

২৫

দু-দণ্ড ঘরের মধ্যে বসে থাকি। দোতলার সিঁড়ি,
সবুজ পর্দায় ঢাকা ঘর, ঘুমে ঢলে থাকা শান,
সান্দ্র আলো, সমুদ্রফেনার মতো শয্যার রেশম,
আর সব স্বপ্ন জড়ো করে তোলা পটুয়ার গড়া
রূপসী : মোমের মতো দুটি হাত, আকর্ণ ভ্রূযুগ,
তীক্ষ্ণ স্তনরেখা, দুটি অনাবৃত পা, সে করভোরু
এক রাত সবুজ জ্যোৎস্না স্তূপ করে রাখে চারিপাশে।
আমি টের পাই তার নাভির সায়রে সন্ধ্যারাতে
হাওয়া শিরশিরিয়ে ওঠে— পুরোনো মাছের ঘাই কাঁপে
সে আমার মাটিতে সেঁধিয়ে রাখা দু-দণ্ড, চুরুটে
সারাজীবনের অবসন্নতা উজাড় করে রাখা—
টেনে নিয়ে যায় সিঁড়ি বেয়ে তার হিম সান্দ্র ঘরে,
তারপর ধকধক করা ঘুঘু-র বুকের মতো তার
যোনির অগাধ সাঁঝে গভীর হাতছানি মেলে দেয়—

চুরি করে দেখে নি সমস্ত ভাঁজ, উচ্চাবচ রেখা।
জয়পতাকার মতো সুখে কাঁপো, জানতে পারো না,
স্নায়ু ওঠে পড়ে একই ঢেউয়ে-ঢেউয়ে— মাথায় পা রেখে
চলে নৌকোসার, চলে পরবের গীতল চীৎকার···
কোথায় পেয়েছ অতখানি তাত? কামনারক্তাভ
ছোট ছোট গোপন ভূখণ্ড পেয়ে ভরাট কাতারে ঢুকে গেছ
পা চালিয়ে ধরতে পারি নি তোমাদের। চুপ করে
দেখেছে গির্জার মাঠ, ভিখিরি ছেলেটা, রিকশাওলা।
জানি ওরা ছবির মজায় জমে গেছে, ফুর্তি করে
ছেঁড়া শালপাতা-স্বপ্ন — একাকার ওড়ে, আর আমার
আষ্টেপৃষ্ঠে গভীর ছবির বলী লিখে দেয়। জানে না কখন
ভরদুপুরের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিজলিঝলক
হঠাৎ ছড়িয়ে গেছে, জলের অস্থির এসে বুকে
ওঠাপড়া করে— শুধু এক হাত দূরত্বে তোমাদের—

২৭

কলমিলতা ভেসে এলো পুকুর-ঘূর্ণায়, পায়ে উঠে
বলে গেল ও পাড়ের বনজ খবর। খুব ছায়া
ঘেরাটোপ ধরে আছে মনে মনে। কলস-উপুড়
ভেসে-যাওয়াটুকু ধরে রেখেছে সুপুরিবন, দিলো
হাতে তুলে। দু-হাতের পাতা ভিজে যায়, গলা বেয়ে
ওঠে সুখ নিস্তাপ বিষাদে— চুপি চুপি নেশা-লাগা
চোখ বুজে বুকের ওপর পেতে চাই সব ছোঁয়া···
পানবোঁটায় ভরা ছিল ভাব, জিভে কামড় লেগেছে :
চোখ বুজে টের পাই রক্ত আর আগুন একই সাথে।
ধিকি ধিকি উড়ে আসে তামাটে-রক্তিম চৈত্রবেলা,
বয়ে আনে মুক্তোর ঝুরির মতো ঝরা পাতা— তার
ইতুভাস্করের ঘটে বেঁধে দেওয়া একগাছি চুল।
কলমিলতা ভেসে যায় জলের ঘূর্ণায়, সে তোমায়
জলের পরতে মুড়ে ডুবে গেছে অজান্তে কখন···

সরাসরি ভেদ করে চলে গেলে— দৃপ্ত আরক্তিম
ঘটনাবলির দিকে না তাকিয়ে, আকাশ-ডিঙোনো
হে আমার অভিলাষ, দিব্য অভিলাষ! ছিঁড়েখুঁড়ে
গেছে জমা শব্দরাশি, চাঁদের মাস্তুলে খোঁচা লেগে
যেমন ছিটিয়ে যায় ব্যঞ্জনাব্যাকুল মেঘভার!
শুধু চারিধার জুড়ে টাঙানো অসীম রাত্রিবেলা,
আর ভাষাহীনতার অরোধ ছোঁয়াচ! হে আমার
দিব্য অভিলাষ, তুমি চাও কি আমিও হয়ে উঠি
সবুজ পুকুর— শান্ত মাছরাঙা— ভিজে আলপথ—
ধান-মাড়াইয়ের ছবি— মালতীপাটপুর— অসহায়
রাত্রি ও দুপুর, …ওরা মেয়েদের শরীর জড়িয়ে
গাছের মতন স্থির: ওদের লাগে না কানাকড়ি।
ওদের মতন নিঃস্ব হয়ে গেলে তবেই কি আমারও
মরাইয়ে হাওয়ার ঘায়ে ঝলকে ঝরবে সোনাগুঁড়ো!

২৯

সব জল শুষে নিয়ে গেছে এসে চৈত্রের মার্তণ্ড।
পথে দীর্ঘ ছায়া হাঁটে, বৃক্ষ ছায়া দেয় না কারোকে।
পাঁকে ডুবে আছে মোষ। পাতা-ছাওয়া বাংলার ভিতরে
মাছের গায়ের ঠাণ্ডা লেগে আছে, ফুলের বদলে
নেশার্ত নিদ্রার মতো ঝরে আছে একটি মানুষী।
গাঁয়ের রাস্তায় বাড়ে রুক্ষ তাপ। নিদ্রা আমাদের
সকল সন্তাপহারী, অথবা নিদ্রার মতো নারী।
মাটির দাওয়ায় বসে আছে সূর্য— তাকে ফাঁকি দিয়ে
ডুবে আছি প্রিয়ার উচ্ছিষ্ট জাম-গাঁজানো মদের
পাঁকের ভিতরে— সেই গ্রামীণ মোষটির শান্তি নিয়ে।
ঐটুকু জীবন শুধু পেতে চাই— ভিজে সুপুরির
ঘোর লাগা পাতাল-আলোয় ডুবে গেছে ধীরে ধীরে
বাঁকারি— চালের বাতা— গোটা বাংলাখানা— শুধু আমি
সাতপ্রস্থ জলের পর্দা চোখে বেঁধে মাছের মতন জেগে আছি—

রোয়াকে হেলান দিয়ে শীতের দুপুর— স্থির ফটো
পোষা বেড়ালের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে— শান্ত ফুলে
অক্ষয় নরম তাপ— মিলেমিশে দেখাতে চেয়েছে
নীল শান্ত রোদ-ফুল-বেড়ালের চিত্রার্পিত সুখ।
আমিও ও সুখের পুরাণ জানি, তবু সগৌরবে
নিষ্পিষ্ট বালিশে সারারাত শুধু অসুখ বুনেছি।
এখন রোদের তাতে গা পোড়ে— জানলার অন্যপারে
যে পৃথিবী— মনে হয় সে আমার শত্রুর পৃথিবী।
কেবল কাঁটার মুখে রক্তের মতন বেঁচে থেকে—
কিংবা শুভ্র পোশাকের গা বাঁচানো জীবন মুঠোয়
রক্ষা করে— চেয়েছি ফিরিয়ে দিতে সব উপদ্রব—
সমস্ত চত্বর জোড়া রৌদ্রবাস ছলনা— সবাইকে।
আমি সুখ চাইনে, দুর্লভ শান্তি চাইনে, কেবল
স্বস্তি চাই— রঙছুট ঘরের ঠাণ্ডা স্বস্তিটুকু চাই!

কুবা— কুবা— সারা দুপুর ঝাটি ঘাস নেবা আলো— এ মাঠ ও মাঠ
মাটির তল থেকে ওঠে চাঙের গমক— হারিয়ে যায়—
কুবা— কুবা— নেবা দুপুরের ছায়া ছেয়ে যায় ডালপালা হলুদে-খর
আগাছায়-লাল—
ফাঁকা লাল ফুঁড়ে হঠাৎ— গায়ে মেঠো রূপ, কুডুল নামিয়ে সোজাসুজি
চায়, পর্ণশবরীর
চোখে বিঁধে নুয়ে যায় তিতিরশিকারী নীল ব্যারেল— নিচু হয়ে
হাতে তুলে নিই খড়— কুবা— কুবা— থেমে যায় তিরকির ব্যস্ততা
দণ্ডভর সারাটা জগৎ স্থির হয়ে যায়— গা চলে না পা চলে না,
মগজ-স্পন্দন-
পাক খেয়ে খেয়ে ঢুকে যেতে যায় কাঠবাদামের খোলা ভেঙে
স্থির স্বপ্নে—
আকাশপ্রমাণ শব্দ বোবা হয়ে যায়, শুধু তলে তলে
চাঙ— আরো অতলে তলিয়ে যায় বিচ্ছিন্ন অথবা দ্বা সুপর্ণা ··
কুবা— কুবা— হাড়মাসবসারক্তে ছেয়ে যায় ঢেউ— চোরাটান—
ছেয়ে যায় নেবা দুপুরের পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়া— গা-উতল নেশা, চারিধারে
শালমঞ্জরির কাঁচা গন্ধ ওঠে চারিধারে ফটিক কানাত গাঢ়
হয়ে ওঠে, আর
আমি মুছে যেতে থাকি কোঁড়া ঘাস জঙলা হয়ে আমারই পায়ের
নীচে, আমি
ছায়ায়-শালফুলে-কাঠকুড়ানীর চোখের আঁধিতে তিল তিল করে
মুছে যেতে থাকি

ভাগ্য জ্বলে যায় ঐ নদীর জলের রৌদ্র-লাগা
স্ফুরিত মুহূর্তে— চলে চোরাটানে— শেষ পাতালের
অপ্রাকৃত জ্যোৎস্না ঠেলে তুলে আনে নৌকোর নাগালে।
ভালো লাগে চাঁদের তলায় স্থির বাসনাবল্লরি
যখন শ্যাওলার স্থির সবুজ জ্বালায়, তলে তলে
অশান্তি ঢেউয়ের মতো ছুটে যায়— মসৃণতা যাচে
বরবর্ণিনীর কাছে, যাচে সেই নাতিশীতোত্তাপ,
যাচে, আর ওষ্ঠে তার ঢেলে দেয় যত জ্বালা আছে।
যায় সুখসুপ্তিঘোরে শুতে এক মুহূর্ত আড়ালে।
কোথায় আড়াল ? শুধ্ রোদে নেচে চলে গঙ্গাজল।
সমস্ত মাটির পাড় অমসৃণতার রক্তপাতে
ভেসে গেছে। নুয়েছে অশথলতা রোদের দংশনে
স্থির ঘূর্ণি ছুঁয়ে— সেই কালো হিম হিংস্র রক্তপাত
বিন্দু বিন্দু লেগে আছে আমাদেরও পিঠে, করপুটে।

এসেছে গল্পের শেষ পৃষ্ঠা ভরে হলুদ শূন্যতা।
ফিরে গেছে কুশীলব, নীহার-ঝরানো রক্তসাঁঝ
রেখে গেছে তোমাদের ঘরের দুয়ারে। অশরীরী
ভয় ঘোরেফেরে—চেনা গলিপথ, পিছন বাগান—
শুধু ভয় এসে সব মুহূর্তে অচেনা করে গেছে।
হঠাৎ আমরাও যেন নাটকের শেষাঙ্কে দাঁড়িয়ে
পাঠ মুখে আনতে পারছি না : এত বিমূঢ় অসাড়
হয়ে গেছি। রূপসী নায়িকা আরো অপরূপা সেজে
বারবার বলে গেছে মুখস্থ নাটক, তবু কারো
মুখে কথা নেই। শুধু গল্পের মহল বন্ধ করে
বাড়ি ফিরে যাবো এইটুকু ভয়, এতখানি ভয়!
ঘরে সন্ধ্যে পড়ে রোজ কুলুঙ্গির ঝাঁপি আলো করে।
শান্ত রোদ লাগে এসে ঘুমন্ত কপালে। তবু সেই
ঘরে যেতে হবে বলে বড় ভয়, ভয়ঙ্কর ভয়।

একদিন ঐ মাঠে সারা পৃথিবীর
সংজ্ঞালোপ ঘটে গিয়েছিল, আমি জানি।
একদিন ঐ মাঠে খররৌদ্রে লেগেছিল আঁধি
আমি জানি সে কথা, আর ঐ মৃত ঘাসফড়িঙ জানে।
আরো যারা জানে তারা আগুন চিবিয়ে জমে আছে
রৌদ্রবর্ষণের ঝিলিমিলি হয়ে, খরোষ্ঠী লিপিতে।
মাঠে তাত বাড়ে, গা-র কানি গায়ে লেপে ঘরে চলে
কিষানী— জলের ছায়া চোখের মণিতে দোলে তার।
আগের দিন কি সেই ছিল অপঘাতিনী ? কে জানে ?
তরল ফুটন্ত নীল বাষ্প হয়ে নামে সারাদিন—
পালায় সমস্ত মাঠ— ধানক্ষেত— মহুলবীথিকা—
শুধু মরে পড়ে থাকে কল্পনাজর্জর ঘাসফড়িঙ
দৃষ্টি রোধ করে, আমি যত্নে তাকে খাতার পাতায়
সেঁটে নি। একদিন তার সমাধিফলক গড়ে দেবো!

৩৫

দেখেছি সমস্ত কীর্তি বৈভব দিগন্তে ঢেলে দিয়ে
সূর্যের দেহান্ত ঘটে—শুধু রটে পাখির বিলাপে
সেই শোক, চিতাগ্নি ঝিমিয়ে এলে শান্ত অন্ধকার
নেমে আসে আমাদেরও কাছে··· সব ভুলে যেতে চাই—
ভালোবাসাবাসি খেলে, তারা গুনে, সোনার আরশিতে
মোমে গড়া অপরূপ বিষাদের শীর্ণ ছায়া দেখে।
টের পাই বুকের গভীরে আছে নদীজল, টের পাই বুকে
আগুনমমতা ঘনসজল বর্ষার মতো গাঢ়—জমে আছে।
টের পাই ভয়ানক সুখ পেতে চাই : গেঁয়ো নদী
যেমন বানের লোভে লক্‌লক্ করে বয়ে যায়
অবিকল সেই রকম। টের পাই দশ আঙুল শুধু
সুখের ভরন্ত স্তন দু-হাতে নিঙড়োতে হা-হা করে।
সূর্যের বৈভবে তার লোভ নেই, হিম শান্ত রাত
তবু তার গুপ্ত লোভ যেন আজ সনাক্ত করেছে—

৩৬

একদিন সমুদ্রপাড়ে গড়েছিলে তাসের প্রাসাদ।
ছিলে হাওয়ামহলের মধ্যে সারাক্ষণ, নোনা বালি
স্নানার্থীর দেহ-ভাঁজ থেকে উড়ে এসেছে কৌতুকে।
দু-দিন বরাদ্দ করা ছিল রাজ্য। সে দু-দিন নিয়ে
ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে বসেছিলে : নারী?— না দেবতা!
মনে নেই কেমন ভক্তির রূপ, রতির চেহারা।
সারাদিন শুধু নব নব ভাবে নিজেকে নির্বাস
করেছ, সমস্ত রাত অজস্র মাছের চলাচল
বিদ্যুতী রেখায় নভ-পথ ধরে— দেখেছ। শেষ রাতে
এলো স্বপ্ন, নিলে তুমি পুরোনো স্বর্গের পাল্টা পথ
অনেক তলায় পড়ে পুরীর বিশাল বালিয়াড়ি···
ডুবেছে দিঘির গর্ভে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কাহিনী···
গরিব গাঁ-টুকু, নগ্ন নরনারী, সেই সঙ্গে তুমিও
চলেছ কুড়ুল হাতে দু-ক্রোশ বনের অন্তরালে—

প্রতি রাত বেঁচে থাকি অলীক নীলাভাটুকু জ্বেলে।
জীবন-ফুরোনো নীলবিস্ফারিত জ্বলন্ত দীপের
বরাদ্দ জ্বালিয়ে প্রতি রাত বেঁচে আছি। আমি তবে
কেবলই ফুরিয়ে যাবো— রোদের তলানি কোষে কোষে
পুঁজি করে আমি তবে কেবলই উজাড় হয়ে যাবো
হলুদ পাতার শীতে— তীক্ষ্ণ কুয়াশায়— শূন্য সাঁঝে—
আমায় রুমাল নেড়ে চলে যায় সাঁওতালি ডিহার
শেষ বাস। মাথায় ভার হয়ে চাপে সন্ধ্যাবেলাকার
শালের ডালপালা, কালো রিক্ত পথে আমার বিস্তার
অন্ধকারে ছেয়ে যায়— গোযানী লণ্ঠনে ছিঁড়ে যায়—
দেহ ছেনে বের করে নিয়ে আসি রাতের মতন
নীল ভক্ষ্যটুকু— আমি আরো একটি রাত বেঁচে থাকি—
নিশি-পাওয়া পথস্রোতে— অজস্র আমার প্রেতযোনি
আমায় নিবোতে এসে সলতেয় ইন্ধন হয়ে পোড়ে—

হঠাৎ আমায় জ্বেলে দিয়ে গেছ : ঘুমন্ত আমার
দৃঢ় দুঃখগুলি উঠে মৌমাছির মতো ভনভনিয়ে
ঘিরেছে তোমায়, যেন নগদ কিনেছ সবখানি।
মৃদু পল্লবের থেকে রুপালি নীহার গলে পড়ে।
বাগ্মিতা পরাস্ত হয় মৃত্যুভীত স্তোত্রের আড়ালে।
হে পুরাণী কাম, তুমি সর্বাঙ্গে মীনাঙ্ক দেগে দ্রুত
নির্ভর করেছ কাচস্বচ্ছ হাওয়া, কাঁপা ইয়ারিং।
দেখে গেছ শূন্য বেদী পিটুলিগোলায় চিত্র করা,
দেখে গেছ আহ্লাদী দুঃখের শোভা দিঘিপাড়ে, বুকে
বসেছে গানের দাঁত,— দেখে গেছ বিস্রস্ত অলীক
পাপড়ি খসে যায়, তবু নিহিত আগুনে ফুল জ্বলে।
ব্রোঞ্জ অশ্ম কাঠ কুঁদে সারাদিন— হে পুরাণী কাম
তোমায় মৃত্যুর থেকে ছিনিয়ে নিয়াসি— দেখে গেছ,
তবুও লঘুতাবশে হাতে কাঁটা দাও, গানে দাহ।

৩৯

ঈশানী মাঠের কোলে ইঞ্জিনের ধোঁয়া শান্ত রুপোরঙে আঁকা
এপার ওপার জোড়া তেরো-আপ মেলের হুইসিল ....
হু-হু হাওয়া ছুটে গেল সমস্ত কাঁপিয়ে—
অফুরন্ত সূর্যাস্তবিভার মধ্য দিয়ে
গাড়ি ছুটে যায়— তারই পিছু পিছু হাসি-দীর্ঘশ্বাস-গান-ডানাভর কাশ
আপনপেরোনো চিরশরতের দেশে ভেসে যায় —
ঘোর-ঘোর— সোঁদালি গাছের দীর্ঘ নিবিড় আবছা পড়ে অফুরন্ত মাঠে
শেষ বক—দলছুট গাভীন আঁতিপাঁতি ডাকে— ত্রস্ত বুনো মেয়ে—
চাকার শেষ রেশটুকু ক্রমে খসে যায়। শেষ দিগন্ত অবধি ঘাটে ঘাটে
নিশ্চুপ রহস্যে জ্বলে সবুজ সিগনাল। বুক মুচড়ে ওঠে হঠাৎ আমারও!
কলের শেষ ভোঁ— শ্রান্তি— রাখা হল্ট— ভালুকভাসানো গারা নালা—
সব পিঠে রেখে আমি একদিন আমারই মুখোমুখি শুধু দাঁড়িয়েছিলাম
পুড়ে ক্ষয়ে অজান্তে আগুনছ্যাঁকা লেগেছে আঙুলে। আমি একবার
চলন্ত জানলায়.
একবার একা মাঠে বিকেল-সন্ধ্যের হাতে-হাতে ফিরে ছেঁড়াখোঁড়া
গান-দীর্ঘশ্বাস-
ডানাভর কাশ হয়ে উড়ে যেতে গেছি শুধু আমায় ছাড়িয়ে —

৪০

একটি দেয়াল-মাত্র পটভূমিকার মতো খাড়া :
এঁকেছি জ্যামিতি, তার পরে আর ভাষা ভরাবার
ফাঁক নেই। দেয়ালের গায়ে গায়ে বছর বছর
তামাটে শ্যাওলার মতো জমেছে শ্রাবণ তিলে তিলে।
খুব তীক্ষ্ণ চোখে চাও : ওরই মধ্যে লতানো রয়েছে
সূক্ষ্ম নকশা, আমাদের অন্ধকার-অন্ধকার খেলা।
ওরই মধ্যে জমে আছে নদীঢেউ, রুপোলি ইচ্ছের
মায়ামূর্তিগুলি, ওরা আমায় আমার মধ্যে থেকে
ছিনিয়ে নিয়েছে, ওরা উদ্ভিজ্জবিশ্বের পাড় বেঁধে
আসল আমাকে টেনে নিয়েছে। — আমার কি কিছু নেই ?
— গৃহপরিবার, উন্নতির লোভ ? আমি কি সবার
পাশে দাঁড়াবার নই ? ···ওরা শুধু ভাষার বদলে
আমায় দেয়াল ভরে এঁকে দিলো। আমি সেই থেকে
শ্রাবণের সঙ্গে ভিজি, জ্যামিতিরেখায় জমে থাকি···

সূর্য ডু'বে যায় প্রত্ন দিগন্তরেখায়, তার কাছে
লহমা সুখের জন্য হাতে পেতে নিয়েছি আগুন।
সারা শীতরাত্রি ধরে মৃত্যু পোহাবার ব্রত। দোর
হাট করে এসেছি : নীল মাটির অমর দেহ থেকে
প্রাণ ছেনে নিয়ে ইষ্টদেবতার বিগ্রহ বানাতে।
সবাই অনন্ত প্রাণ আশীষ পেয়েছে : ওই নভ,
ওই নদীজল, ওই কাম ও দিব্যতা। শুধু আমি
সারাদিন সারারাত বিনিদ্র প্রাণের তাড়া খেয়ে
কুকুরের মতো এক পাড়া থেকে আরেক পল্লাতে
ঘুরে বেড়িয়েছি। সব মুখগুলি সুন্দরীর মুখ—
সব পথ-পার্শ্ব জুড়ে সুফলা বৃক্ষের লোভ—তারা
সর্বাঙ্গে জীবন জেলে আমার স্পর্শের বাইরে শুধু
বেঁচে থাকে অনন্ত প্রহর, আর দু-হাতে আমার
তুলে দিয়ে যায় শুধু একরাত ঘুমের বরাভয়।

একটি সবুজ মঞ্জরির মধ্যে এক পল্লী বসতি গুটোনো।
একটি শব্দের চিহ্নে চিনে রাখি সবুজ মঞ্জরি।
তারপর একদিন বৈশাখী হাওয়ায় সব সবুজাভা উড়ে-পুড়ে যায় :
পড়ে থাকে শীর্ণ কাদাগোলা জল, শকুন-ঠোকরানো গলা শব।
এক-এক মুহূর্ত ধ্বনি হয়ে জ্বলে। পায়ে আছড়ে পড়ে ঘোলা জল,
হাওয়া স্থির হয়ে আসে, পেঁচা বুঁদ, কাছে দূরে জোনাকিপোকার
শান্তি জ্বলে,
জ্বলে সারা রাত তীক্ষ্ণ সপ্তর্ষিমণ্ডল : আমি সবাইকে আমার
ঘরের নাগালবন্দী করে বাঁচি— যারা কেউ আমায় চেনে না।
আমি ইন্দ্রগোপ হয়ে কেবলই সেঁধিয়ে যাই আরো তলে আরো,
স্থির জীবনের মধ্যে, পাতাল উদ্ধার করে ঘরের কানাচে
ছড়িয়ে দি, সারাদিন দু-চোখ-বিস্তার আলো দেহে পুঁতে শামুকের মতো
নিজের আড়ালে জাগি। চক্রে চক্রে জেগে ওঠে আদিম মাটির
কানাকানি।
বাইরে কেউ নেই, শুধু আদিগন্ত অন্দর সাপের মতো নড়ে-চড়ে ওঠে।
জীর্ণ দাগী তামার টাটের পরে কুণ্ডলিত হয়ে পড়ে থাকে বাঙলাদেশ…

ধুলোর গড় এঁকে গেছে দিশি বাস দুপুরের গায়ে, বাবলাবন
এগোতে না পেরে শুধু তল হয়ে চলেছে স্বপ্নে পায়ের তলায়। সারাদিন
কুলপিহাট থেকে গেছে ভারে ভারে বড় মাছ রঙিন গামছা
কুলো নাইয়ে ফেরা এয়োতিরা সব— কবে, আজ হদিশ পাই না।
আজ হাতে হাতে নিঙড়ে ফেলি শুধু প্রবাসী মাটির নুড়ি তুলে।
পার হতে গিয়ে সাঁকো টলে যায়, দীর্ঘ নদীচরে-চরে কেবল যক্ষার
পাংশু চাউনি, জেলেপাড়া জুড়ে শুকোয় শঙ্কর মাছের লম্বা লেজ—
যে যার নৌকোয় ফিরে গেছে শুধু অর্থহীন আঁষগন্ধ রেখে।
গা গুলিয়ে ওঠে। যেন নিজের ভারটুকু পুঁতে দিয়েছে আমায়
ঝাঁঝরা মূঢ় নিষ্পাতা ডালপালা এক বয়সী গাছের মধ্যে। সারাক্ষণ
টের পাই তিলে তিলে ধসে যায় বালির প্রাকার, বান ঢুকে আসে।
টের পাই শেকড়ে পিঁপড়ের ঝাঁক, ডালে ডালে বিষাক্ত ভীমরুল।
ঘন ঘন ভোঁ দিয়ে স্টিমার চলে সুতোহাটা। গা আদুল করে
ছেলেরা দৌড়িয়ে যায়, জল ছোঁড়ে— চোখে চোখে জমানো ওদের
মেলার জলুষ কেড়ে এক ফাঁকে সাঁঝ জ্বেলে দিয়ে ফেরে জোনাকিরা
বাবলা ডালে ডালে— যেন সেঁক দিতে থাকে শুধু ঘুম পাড়াবার
অছিলায়—

কেবল কয়েকটি শব্দ স্পষ্ট করে বলতে শিখেছি।
সব শুষে নিয়েছে তা কোঠাবাড়ি। ফাঁপা আয়তন
দেয়ালিপোকার মতো আছড়ে মরে দীপের দেয়ালে।
তীব্র তৃষ্ণা নিয়ে ওরা ছুটে গেছে, পদপংক্তি গড়ে
সাজিয়ে দিয়েছে অর্ঘ্য বধির স্তম্ভের নীচে নীচে,
দমকা বাতাসের সব সাউখুড়ি বিভ্রান্ত করে ওরা
শেষ নির্যাসের রঙ সাজিয়েছে ষোড়শোপচারে !
শুধু আনাগোনা ঢের রাত্রি ধরে। কেউ চেনা নয়।
সবার বিছানা ঢালা দু-চোখের একচুল আড়ালে।
কাকে ছোঁবে ? সবার উড়ুনি আদি-লহমার ঘন
কাজলঝর্নার মতো দেহ বেড়ে, সবার চরণে
গাঢ় লক্ষ্য, তবু তারা ভাস্কর্যের মতো নিরুচ্চার।
শুধু ছুঁতে পাবে লোভে যখন সারা গাঁ আছড়ে মরে,
মৃত্যুর স্ফটিকাধারে ওরা বেঁচে থাকে জিঘাংসায় !

নিজে হাতে গোর দিয়ে এসেছি পিপুলডাল-ক-টি :
কখন কোথায় নিয়ে যেতে চায় জানি নে, ভয় হয় !
এখন কেবল ভয় শব্দগুলি, বোবা অন্তর্ভাষা।
বইয়ের মলাট মুড়ে মেরেছি পাটল কাঠবেড়ালি,
জলরম্য বাগ, শান্ত পোস্টাপিস, শাদা পথরেখা,—
তবু বন তোলপাড় ঝড়ের মুখে বয়ে আসে ভয় !
হাজারো শব্দের ঝড়ে ঝলে মুহুর্মুহু বাজ, শিলা
মন্ত্রের মতন বেঁধে ! অন্ধ মাটি দিয়ে নিজে হাতে
নিজেকে চাপা দি, তবু জ্যোৎস্নার সবুজে কাঁপে গোর
আমারই সুমুখে। আমি রাত্রি থেকে দৌড়ে ছুটে আসি
অলীক প্রভাতে : পায়ে গলে উষ, কাঠবেড়ালির
নরম পিঠের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে মুদে থাকি
সংবৃত বইয়ের মতো— তবু কেন এড়াতে পারি না
তাত, গন্ধ, আর্তি, চারিধারের বাঙ্ময় অন্তর্ঘাত !

কেবল আমারই জন্যে থানা পাতো নিশ্চুপ দুয়োরে।
কেবল আমারই জন্যে দিনে-অন্ধকারে কৌতূহল
কণ্টকিত করে রাখো। নিঃস্বপ্ন গভীর সুষুপ্তির
কালো বর্ত্ম ধরে আমি একা যেতে চাই— অবসাদে
কাদার অতল স্নেহে গেঁথে যেতে চাই— শুধু চাই
আমায় নিস্তার দিয়ে যাও তোমাদের দিবালোকে,
মাতো প্রেমিকার সাথে— সিদ্ধি কীর্তি সব কিছু জড়িয়ে।
কেন দিতে আসো বয়ে অযাচা কৌতুক দিনে রাতে!
আমি মরা বর্ত্ম ধরে হেঁটে যাই : অনন্ত অভ্রান
হতাশ কুয়াশা নিয়ে ধরে আছে সস্নেহে আমায়।
আমি গাছ হয়ে বেড়ে উঠেছি আড়ালে বারংবার
মঞ্জরিত হয়ে আমি ঝরে গেছি নিঃশব্দে— কেবল
দেখেছে শিয়রলতা— গাছ শুষে অহঙ্কার যার।
তারও বেশি রঙ ধরে আছে বুঝি তোমাদের সুখে।

দূর পাড়াগাঁর এক অচলিত সংগ্রহ দেখেছি।
এক রাতে অগম অন্দর তার লুট করে এই
শাদা কাগজের মধ্যে সঙ্কলন করেছি সেকেলে
তামাটে সবুজ। জানি পুরোনো দাপট শুধু আজ
আমারই উপরে দণ্ড ধরে আছে। আর সব ঘর
নতুনা রূপসীদের নিয়ে সুখে-সচ্ছন্দে সাজানো।
হা হতভাগিনী! যার মাঠে মাঠে কেবল নির্বোধ
তৃণতৃপ্তি—পাঁকের দুপুর-ঘুম—বিচুলিগাদার
সন্তুষ্ট দারিদ্র্য, যার প্রেমিকেরা শৌর্যহীন, যার
কটাক্ষ ছিল না চোখে কোনোদিন—প্রেত ও ঈশ্বর
হাত-ধরাধরি করে যার রাত্রে পেতেছিল বাস—
শেষে যে নিজেই মরে ভূত হয়ে গেছে এক রাতে···
ফের এসেছে সে—হাতড়ে তুলেছে কাগজ—চুপি চুপি
সবুজ ছুপিয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে আমারই ভিতরে।

কেবলই ঘা দিতে চাও! বাগান মাড়িয়ে হু-হু করে
হাওয়ার বিরুদ্ধে নামো মাটির অতল গর্ভগৃহে।
বর্ণ গন্ধ স্বাদ সব বেলুনের মতো ফুলে ওঠে
মরশুমি মঞ্জরি ভরে—পাতার জানালা-পার পাখি
নীলিমায় উড়ে যায়—সমস্ত নিষ্পাপ অশ্রুকণা
মুঠোর ঘৃণায় কচলে ফেলে দাও! হাঁ করে বাগান
গিলেছে সমস্ত ক্লেদ, মনসাকাঁটায় ছেয়ে গেছে।
চাঁচা বেড়া, সযত্ন শুরকির রেখা পিছে ফেলে রেখে
কুটুমবাড়িতে গেছে বাড়িউলি, ফুলতোলা কানাত
ফালা ফালা করে চলে গেছে যারা উৎসাহী দর্শক।
তুমি একা আছো, ঘরে সন্ধ্যা ঢুকে আসে, বাতিদানে
নিথর রেড়ির তেল : আগুন জ্বলে নি, শুধু ঘৃণা
জমে আছে। ভাড়াটের আহ্লাদ-সম্বল জড়ো করে
তুমি সামনে তার রাত জাগবে বলে জাঁকিয়ে বসেছ!

তীক্ষ্ণ রঙে আলো করে নাও দূর দিগন্ত অবধি।
বাঁকে বাঁকে স্তম্ভিত প্রত্যাশা, আর সড়ক ভরানো
বিনীত আগুন—এক-একবার শুধু রোদ ছিটকে ওঠে
দৈব-আলোড়িত মধ্যদিনে। নও ছবি বা ছলনা,
তুমি এসে হাত রেখে চলে গেছ বাড়ন্ত ভাঁড়ারে।
তুমি উপচীয়মান শস্যের মতন তীক্ষ্ণ রঙে
আলো করে আছো দূর দিগন্ত অবধি। বেলাবেলি
পাথরবোঝাই ট্রাক ছুটে চলে সুবর্ণরেখার
পাড় ধরে, সব সম্ভাবনার দুশ্চিন্তা পায়ে দলে
স্বপ্নের টগরে লাল করে জ্বালে দৃঢ়-বাঁধা চুল
উরাঁও কামিন··· পায়ে পায়ে ঘুরি, তবু অবসাদে
মুড়িয়ে স্তূপিত হয়ে পড়ে আছে সর্বস্ব আমার!
অপরূপ দৃশ্যে দৃশ্যে বাঁধা পড়ি, সে দণ্ডেই তবু
পা পিছলে তলিয়ে যাই স্বগত গর্ভের অন্ধকারে···

৫০

আমাদের জন্যে আছে পথ-জোড়া ফাঁদের চোরাটান।
নিজেকে বাঁচাতে নিচু হয়ে গেছি, ভালোবাসতে গিয়ে
পিছিয়ে এসেছি : শুধু চোরা খুন, ঢাকা পোড়া দাগ
নিয়ে রাত্রিভোর জেগে নিজের বুকের আর্তি লোভ
শুনেছি, গায়ের মধ্যে রক্তস্রোত চাপা তপ্তস্রোত
চঞ্চল বিদ্রোহে সব ওলোটপালোট করে গেছে।
আমাদের মাথার উপরে কার এত লোভ ? বিনা পুরস্কারে
রাত্রি-তারা-অন্ধকার সবাই এসেছে শুষে নিতে !
আমরা বিক্রি হয়ে যেতে চাই রোজ শহরবাজারে।
নিজেকে ডিঙিয়ে সাজি পণ্যের বদলে ফিরিওলা।
শুধু ঘাম ঝরে, তালু তৃষ্ণায় শুকিয়ে আসে, শুধু
বাঁকে বাঁকে পাতা-ঢাকা ছল থাকে অপেক্ষায় বসে।
আমরা বুরুজের মতো ঊর্ধ্বে উঠে চলি, কাক-ভোর
হেঁকে হেঁটে যেতে চাই ঘণ্টা থেকে অমানুষী নীলে—
আর বারংবার আছড়ে পড়ি ঐ গলন্ত সড়কে !

বাইরে চীৎকার শুনে দ্রুত দোর রুধেছি, অন্দরে
সারাদিন বন্দী বাতাসের তারস্বর ফিসফিসানি···
কেবল দেয়াল ছাড়া সঙ্গী নেই, তবুও ঘর-জোড়া
হৃদয়ের অভিযোগে দু-কান বধির হয়ে আসে!
শুধু পরিত্রাণ পেয়ে পথ থেকে ছাদের তলায়
পালিয়ে এসেছি, কালো নিথর শানের মধ্যে তবু
দেখি জ্বলে আছে এক উপোসী চিত্তের হুতাশন :
আমায় একলা দেখে অবরোধ ভেঙে হু-হু করে
ছুটে এলো। কৃতাঞ্জলি হয়ে একটু অবসর যেচে নিতে চাই,
আগুনে নারীর মূর্তি ফুটে ওঠে : আগুন আমায়
গ্রাস করে নিতে এলো জ্বলন্ত নারীর ছদ্মবেশে···
এখন আর ঘর নেই, বার নেই—একমাত্র আমি
সর্বাঙ্গে ভুঞ্জন করি নিজের রচিত অন্তর্ঘাত।
—'আমায় বাঁচাও!'—ঘর ছেড়ে যায় নিস্পৃহ লহমা—

সারাদিনে লক্ষবার অগ্নিকাণ্ড বাইরেভিতরে
অসীম জড়তা পুড়ে খাক হয়ে যায়, তবু থাকে
ছিঁড়ে যায় মাথার দু-ধারি রগ— সন্ধ্যার কলকাতা
দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ফুটন্ত দুঃস্বপ্নে ! সারাদিনে
লক্ষবার অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে— বাকি আছে শুধু
রাতটুকু ফুরোলে লক্ষ আলপিনের উদ্যত হরফে
খবরকাগজ জোড়া বাসি সংঘর্ষের খতিয়ান।
ভোরের হাওয়ায় জাগে অসীম জড়তা, ভোর দেখে
পালাতে দৌড়োয়— অগ্নি বেড়ে আছে ঘবের চৌকাঠ।
কাঁথার ওমের মধ্যে মুখ গোঁজে— আগ্নেয় তুষারে
পুড়ে খাক হয়ে যায়, তবু থাকে অনেক পোহাতে।
বহু দূর থেকে ফাঁপা দেয়াল উৎখাত করে ডাকে
জলজ জঙ্গল, লণ্ডভণ্ড করে শহরবাজার—
ছুটে আসে বিপুল নোঙর, চূর্ণ কাচের মতন ঝরে যায়—

৫৩

ডুবে গেছি পরিবহনের নীচে, জানি নে কখন
রক্ত ভরে এলো ঘুম। মস্ত ষাঁড় নড়ে-চড়ে ওঠে
রাস্তার ওপরে, পাখি উড়ে যায়— জানি নে কখন
নভ আর রাজরথ্যা এক হয়ে গেছে : মুমূর্ষুর
চোখের ছায়ার মতো, ঝরে গেছে আঁজলায় কখন
সূক্ষ্ম-শুদ্ধতর এক পাখির উড়াল, বৃষনাদ ।
ভয়ে দোলে স্ট্রিট-লাইট— যেমন হাওয়ায় স্ফীত ফল
দুলে ওঠে— হলদে-চুল কাঠকুড়ুনির দু-টি হাতে
নেমে আসবে বলে : সেই জরামরা কল্পনা সম্বল
জেগে উঠি, ভেসে যাই ঘুমের শহরে : অলিগলি
কেল্লা-বাঁধা নালা-মাঠ-ধরমস্থান পেরিয়ে— সবুজ
বিশল্যকরণী ভাঁটিখানার দরজায়··· কে আমায়
চিনতে পেরেছে— আমি ডোবা মানুষের দেশ থেকে
উজিয়ে এসেছি আরো অকাতরে ডুবে যাবো বলে···
কানাকড়ি নেই, শুধু ঢুকতে দাও, একটু পথ ছাড়ো-

ভালো মনে কিছুই চাও না—জাদু নয়, অপরাধও নয়।
শুধু মগ্ন হয়ে থাকো হৃদ্য অসন্তোষে। এত দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে ওঠো চোখ ঝলসে যায়, এত ক্লান্ত করো
যেমন অভ্যস্ত ক্লান্তি জেগে থাকে চন্দ্রমামণ্ডলে।
শুধু স্মৃতি হাতে আছে আমাদের—তা দিয়ে কি কোনো
পণ্য কেনা যায়? তুমি লাল রিবনের ঘোড়াচুড়ো
বেঁধে প্রতি রাত্রে বসে থাকো ঐ মিনারতলায়।
তোমায় বেবুশ্যে ভেবে আঁখিঠার দিয়ে যায় যারা
সেই সব ধনীনন্দনের জন্যে তোমার যা কিছু গরিবানা।
শুধু আমাদেরই জন্যে অন্ধকারে গল্পের চমক
জ্বালিয়ে পিদিম হাতে সুদূর রহস্যে অকাতরে
ঢুকে যাও। তারপর সারা রাত রুদ্ধ দরোজায়
আমাদের লতানো স্মৃতির ঝাড় বেড়ে ওঠে মত্ত অভিলাষে,
অকাতরে ফেটে পড়ে অজস্র মিথ্যার ফুলে ফুলে।

ঊর্ধ্বের বর্গমাইল আষ্টেপৃষ্ঠে অয়সকাঠামো বাঁধা— এই রকম
ঋতু কেটে যায়— ঝঙ্কৃত ক্রেন শূন্য আস্বাদ করছে গলা বাড়িয়ে
রুপালি জিরাফ··· নীচে পিঁপড়ে সার পিঁপড়ে নড়াচড়া করছে
চিনির দানায়
ভেতরভরাট কাদার পিণ্ডের মতো : আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে বল
ভেতরের সব ফাঁপা ঠেসে নিলে কত সুখ ! বলে যা কী করে
শুঁয়োয় জমিয়ে রেখেছিস সব প্রাণকণা, সবটুকু মরণকামড় !
আমিও সমস্ত দিন ভারা বেয়ে উঠে গেছি শেষ স্বর্গে, আমিও সমস্ত দিন
পিঠে বর্ষা-ফলা পায়ে দুর্বার পতন বেঁধে খুঁজেছি পিঁপড়ের দিনান্তের
শ্রমিষ্ঠ পাতাল,···· তার বদলে খড়কুটো ভেসে উঠেছে,··· সপাটে
থেঁতলে দিয়ে গেছে দ্রুত রাজট্রাক ! আমিও সমস্ত দিন
ইঁদুরের মুখ থেকে খাবার বাঁচাতে শুধু পিঁপড়ের অস্পৃহাটুকু জলাঞ্জলি
দিয়ে
খুঁজেছি মাথার চাল, মুক্ত হাওয়া, গোড়ালি পোঁতার মতো পাঁক···
উই-ঠাসা ফুসফুসে শিস— একটানা ক্ষোভ— বোবা অশ্মিত চীৎকার
ছেয়ে গেছে ! আমিও সমস্ত দিন খাঁচার আড়াল থেকে দেখেছি নীলিমা,
আজ আমার
হাতে হাতে ফেটে পড়ে খুনের লালস !

এক আঁজলা জলের জন্যে ঠায় বসে আছি— বেলা যায়,
সাথে সাথে সব রোদ গলে ঝরে যায় অকাতরে।
মাটির তলায় চলে সুতোর ধারায় জ্যোৎস্না-ঢালা
নিভৃত নিষুতি। টের পাই যেন কাঁধে কাঁধে জমে
উঠেছে বিপুল রাকা দুর্ভার সৌন্দর্যে স্তূপ হয়ে···
এত ঘুম বিবশ ঘুমের মধ্যে নড়ে চড়ে ওঠে :
অতর্কিতে রক্তে রক্তে দুরন্ত রক্তিম ব্যভিচার
জাগিয়ে তুলতে চায়! আর সেই নিভৃত সুখের
সুমুখে শরীরী হয়ে জেগে ওঠে অপরূপা পাপ।
রক্তের অতলে বয়ে চলে এক সুতোর ধারানি,
সবার— সবার— অগোচরে এক জলচঞ্চলতা
বুকে কেঁপে ওঠে : যেন ইঁদারার গভীরে হঠাৎ
দূর মুখচ্ছায়া ভেঙে-চুরে গেছে— যারা এসেছিল
এক আঁজলা জলের জন্যে, ফিরে গেছে আমায় লুকিয়ে··

মুখে স্মিত রেখা পড়ে : লৌহদৈত্য, মোজা লেপটে থাকা তার ভৃত্যযূথ
ঘুরতে ঘুরতেই এসে কুশল শুধোয় : পুরু জামাজোড়া গায়ে, মস্তিষ্কের
কোটরে জ্বলন্ত লাভা, তবু চান্দ্র ফাট উলসে উঠেছে দু-গালে।
শ মাইল লম্বা পিচ ঘন স্তব্ধতায় উপচে ওঠে···
অতিকায় সূর্যের ফোয়ারা নেমে আসে হু-হু করে—
চোখে ধাঁধা লাগে— তবু পুঞ্জিত নিজেকে নিয়ে ছুটি··· ক্রমাগত—
ক্রমাগত··· ঝাঁক ঝাঁক বেগুনি মাছির লোভে— কালো ক্লান্ত লোভে।
আমরাও জানতে চাই— 'ভালো তো !'— সহজে অতি সহজে আমরাও
বিষাক্ত ঘৃণার ঝাঁঝ জ্যোৎস্নার মতন ঢেলে দ্রুত
মৌচাকের মধু-মোমে মিশে যাই একত্রে সবাই।
সব ব্রতমণ্ডলের আঁক উঠে গেছে, শুধু আছে
ধুলোর ঝাপট-লাগা থাম আর থাম— অমানুষী
আকাশ-মাথায় ছোটে শ মাইল পিচ··· কারও জানা
নেই ওরই তলে তলে লক্ষ হৃৎস্পন্দন মরে আছে।

৫৮

লুব্ধ হয়ে আছে এক দীর্ঘজিভ দিন। রোদে রোদে
উঠেছে পারদ : যারা এক তিল ছায়া দিতে পারে,
তারা সুখ-শ্রান্ত হয়ে খসখসের নেপথ্যে হাই তোলে!
এরই মধ্যে আমায় বেরোতে হলো। সঙ্গীর অভাব
মেটাতে সুমুখে হাঁটে আমারই আঙার ছায়া হয়ে।
সমস্ত পথের তরু নিষ্পত্র। কেবল যারা আজও
প্রেমের লুব্ধতা নিয়ে চেটে নেয় নারীর শরীর,
তাদেরই লালায় শতাব্দীর হিম। তেমন স্পষ্টত
কেউ তো আমার সামনে নেই, তবু রাস্তায় রাস্তায়
আমায় দু-ফালা করে ছুটে গেছে গাড়ির কাতার···
বিদেশিনী-সাজা কালো চশমায় নিজেকে ঢেকে শুধু
হাসির ঝলক ছুঁড়ে ছুটে গেছে! আমি কারো ছোঁয়া-
এমন কি একটুখানি দুঃখেরও আরাম না-বোঝার
সাধ্য নিয়ে নিয়েছি তাদেরই পিছু খর দীর্ঘ রোদে···

শুধু পাগলেই জানে যুক্তি, শুধু গৃহপতি জানে
নামের মাহাত্ম্য। আমরা পাশপত্র কোথাও পাই নি।
নষ্ট প্রেম বুকে ঢেকে বাড়িতে ফিরেছি চুপিরাতে।
আমরা একদিন ভোরে সব ভেঙে বেরিয়ে পড়বো
মনে মনে জানি, শুধু বিনয়ীর নিরাপত্তাটুকু
ভাঙতে পারি না বলে প্রকাশ্যে সাজি নি কুলাঙ্গার।
রক্তাক্ত সীমান্ত থেকে দেখি বায়ুভূত আত্মা রোজ
জেগে ওঠে, হাওয়ায় ফুঁপিয়ে ভাসে নিহত জিগীষা।
বৃষ্টির ঝলস লাগে চোখে মুখে : দেখি বর্ষাবেঁধা
আত্মা জেগে ওঠে, ঐ বর্ষার ওপারে ভেসে যায়।
নষ্ট প্রেম বুকে ঢেকে খুঁড়ি শুধু নিজেকে : কোথাও
জলের নিঃস্বন জাগে, কোথাও কেবল কাঁটাতার
সঙিন উঁচিয়ে। —আমি প্রেমিক? গ্যাংস্টার? দাগী চোর?
কিছু নই, আমি শুধু কাচপাতা, সুঁচোলো কাঁকর।

অপরিচিতেরা যায় ত্রস্ত পায়ে ; দোরের ফলকে
'কুকুর হইতে সাবধান' — এক মুচিপাড়া-বাণী
হলুদ-মেশানো বিজলি-বাতির সৌরভ শুঁকে দ্রুত
সারা শহরের দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় ভেসে গেল···
ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে রুধে-রাখা গীটার-গোঙানি
তলে তলে প্রতারণা করে যায়— নিশ্চোখ কাচের
শার্সির এধারে হু-হু করে ওঠে অনল হার্ডল্
ডানা নেই, বজ্রের সঞ্চয় নেই, ঘুচেছে সমূলে
বড় বড় চোখ মেলে থাকা সেই নদী-বৃক্ষ-লতা —
চিলের নাগাল-পার শূন্য— তারা-তীক্ষ্ণ রজনীর
দুর্বোধ পীড়ন, শুধু ধোঁয়ার ভিতর পশমিনীল
আঁধার পুনরাবৃত্তি করে যায় : দ্রুত সরে যাও —
যার যেথা বাস সব ছেড়ে যাও— সাঁঝে যে কুয়াশা
জমে ওঠে তারই মধ্যে জখম লুকিয়ে বেঁচে থাকো।

কুলুপ পড়েছে ঘরে গাঁয়ে গাঁয়ে, অন্য ধরনের
শ্রমিককল্যাণী বাসাবাড়ি পেয়ে উঠে গেছে তারা।
কলাই উঠেছে খুব এ মরশুমে—দেখতে এসেছে
বিদেশী ট্যুরিস্ট, রোদচশমায় নরম হয়ে জাগে
শ্যাওলাজর্জরিত দিঘি, কলাবন, ধর্মের দেহারা।
ভিখিরির পাল এসে বেচে যায় জাম, পানিফল,
মসজিদের মীনা, তারা ঝটাপটি করে ফিরে গেছে
রাষ্ট্রীয় স্বাচ্ছন্দ্যে, তবু কৃতজ্ঞতাহীন দুর্বিনয়ে
রাতের আড়ালে ফ্ল্যাটবাড়িতে আগুন দিয়ে গেছে।
আমরা সংবাদপত্র জুড়ে ছাপি মূঢ়তার ছবি।
গনগনে আগুনে রুটি ফুলে ওঠে; সারি সারি হাত
মেলেছে আকণ্ঠ ক্ষুধা, দামের বদলে ঘৃণ্য ছুরি…
মোকাবিলা নিতে ছোটে হাজার রোবট : ওরা ছোটে
আরো শেষ প্রান্তে—মজা খাল পেয়ে নিশ্চিন্তে ঝাঁপ দেয়

ঢের দিন হলো ছাদে গজিয়েছে মরণশেকড়,
ঢের দিন হলো নাটমন্দিরে বাদুড়, আমাদের
শরিক উঠেছে বেড়ে ধান মাছ নিয়ে রাতারাতি···
আমরা নাড়ি ছিঁড়ে চলে এসেছি একহাত জুয়া নিয়ে
আস্তানা গেড়েছি পথে— বীরপুরুষের মতো চাঙা
ক্ষত আর খুন নিয়ে আস্ফালন করেছি, তবুও
যার যোগ্য নই সেই ক্ষুধা এসে অনড় কোটর
গেড়েছে জঠরে ! আমরা আকাঁড়া কাটারি হাতে নিয়ে
এ ওর ভার্যাকে টেনে সুখ পোহাবার আয়োজন
বানিয়ে কাচের মতো গুঁড়ো হয়ে যাই। অত কাছে
হলুদ শহর জাঁকে সেজে ওঠে— ইঁদুরের মতো
মাটি সিঁধ দিয়ে ঢুকি, ঢুকতে পাই না তবু কেউ !
শুধু কানে আসে শুনি এ বছর দালান দিয়েছে শরিকেরা,
আমাদের ভিটেয় জেগেছে এক অপ্রাকৃত স্বাস্থ্যল সবুজ।

৬৩

জানি আজ শহরতলিরও সব বৃক্ষের পরিধি
বহ্নিগর্ভ হয়ে আছে ছায়ায় ছায়ায়, আমাদের
যত দুঃখ-তাপ নামে চুপি চুপি পাখির কুলায়ে।
কার কাছে আজও আছে সঙ্গীতের শ্রুতি? অন্ধকারে
গা ঢেকে লুকিয়ে আছে মিশুক কালভার্ট, দিনান্তের
আড্ডার কাকলি শেষ হয়ে গেছে, মাঝখানে কেবল
শীর্ণ সড়কের মতো পড়ে আছে ত্রস্ত বিজনতা···
যা কিছু শুদ্ধতা জমে আছে শুধু ঘাসের ডগায়—
হিম হয়ে, রক্তবিন্দু হয়ে, কিন্তু আজ আমাদের
কান্নো অবসর নেই ভালোবাসি। কারো অবসর
নেই যে জমিয়ে তুলি উপমারূপক খাতা ভরে।
যে সব উপমা ছিল কণ্ঠাভরণের দ্যুতি নিয়ে,
আজ তারা ছুরির ফলার মতো বিঁধেছে সবার
ক্ষতস্থানে : দাপিয়ে তুলেছে যত ফুলাভ যন্ত্রণা।

যে সব সুষমা আমি একদিন দেখেছি তোমার
চারিধার বহ্নিপ্লুত করে আছে, যে সব সুষমা
দেখেছি মেঘাঢ্য দিনে তারাদৃপ্ত রাতে তোমাকেই
প্রদক্ষিণ করে ঘোরে, যে সব সুষমা হাতে হাতে
শব্দে শব্দে সঙ্কলন করে নিতে গিয়েছি একদিন,
আজ তারা সব সমাহৃত হয়ে আছে শুধু ওই
গাছের প্রতীকে। 'বৃক্ষ, তুমি কার?' — বৃক্ষ নয় কারো
তবু ধরে ফুলভার নিয়মিত ঋতুর নির্দেশে।
তার রক্তক্ষরণের মধ্যে আমি জ্বলন্ত বাসনা
মণ্ডন করে নি। ঊর্ধ্বে বৃক্ষশিরে নভ পা ছোঁয়ায়
যেখানে, সেথায় তন্ন তন্ন করে খুঁজি, লুপ্ত সুখ
যদি এক তিল তার গুণ্ঠন ঘুচিয়ে দেখা দেয়।
সবাই— সবাই— চেনে ঠিক সুষমাটি তার। শুধু
আমারই পথের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ পরুষ কুয়াশা।

সারাক্ষণ রুষে আছো। গাছপালা গৃহধিষ্ণ্য সব
বৈশাখ সঞ্চয় করে বসে আছে বাঘের মতন।
সারা দেশ অরাজক··· হাওয়ায় বারুদগন্ধ ওড়ে,
ধর্মার্থকামনা ছেড়ে অখাদ্য মাংসের লোভে ঘোরে
অগ্নিচ্ছায়া, ঘরে চাল নেই, ঘরে অন্নপানি নেই—
ভীষণ শ্যেনের মতো নেমে আসে— ছোঁ মেরে বাবলার
সবুজ মঞ্জরি ছিঁড়ে নিয়ে যায়, যে যখন পারে।
আমরা জানি না কেউ এ কি রোষ? এ কি অভিমান?
মাথায় দুঃস্বপ্ন বয়ে জেগে চলি— গাঁয়ের সীমানা
শ্লথ পায়ে ছুঁয়ে ফের ফিরে আসি। সবার উঠোনে
নিষ্পাপ কল্মষ লেপা। গো-মড়ক হয়ে গেছে বলে
ঘরের কন্যারা গেছে উপার্জনে। আমরা কেবল
নিঃশিহর কাম নিয়ে জরদ্গব, সূর্যের ঝলক
শুষে ঋজু থাকি, খোঁজ নিতে চলি পাশের দুয়োরে।

কেন অতর্কিত শৌর্য নিয়ে আসো— নারাঙী শোণিত
বিস্ফারিত করে স্তূপ ছায়ায় প্রচ্ছন্ন হয়ে য'ও !
কর্কশ হাওয়ায় কাঁপে শোকগাথা। আলো নিবে যায়।
মঞ্চে অলঙ্কৃত হয়ে জ্বলে ওঠে কাঠের কিরীচ।
বড় দেরি হয়ে গেছে। ঘূর্ণিফল গাছে পেঁচা চুপ।
কখন বদল হয় খেলা কেউ জানে না। কেবল
তুমি একা অন্তর্হিত হয়ে গেছ বীরের দ্যুলোকে।
তোমায় চেনে না ঐ সূর্য-সেঁকা মাঠ, ছোট ছোট
সোনালি উদ্ভিদ, তুমি মাটির নীরন্ধ্র নীচে একা
পিষে যাও মাটির আক্রোশে ! তুমি একলা চত্বরে
উদ্‌ভ্রান্ত ধাঁধার মতো যমোৎসব জাগিয়েছ দেখে
ঝাঁক ঝাঁক আলো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মোৎসর্জনে !
জ্বলে ওঠে দণ্ড, তবু তখনই চত্বরে স্বচ্ছ কালো
সুরার নিটোল তাড় জেগে ওঠে, রক্ত ধুয়ে যায়।

রঙ— রঙ— নির্বিকল্প রোষ আছড়ে পড়েছে চৌকাঠে।
গোধূলির চেনা পরিভাষা ছেড়ে অচেনা মানুষী
রক্ত খুবলে নিয়ে গেল পলস্তারা একহাত প্রমাণ।
দিনের আগুনে রঙ পুড়ে গেছে, রাতের কালোয়
ব্যর্থ হয়ে গেছে রঙ দিন দিন— আজ অবশেষে
সবার নিহিত— গোটা জাতের বিলাস— রক্তরঙে
অতিথির মতো এসে ডাকলো : জায়গা দাও। ভয়ে মরি,
শুনেছি অজ্ঞাতকুলশীল আর সুরূপা কেউটের
একই পরিচয়, তবু এত গাঢ় স্বরে আমাদের
দুয়োরে ডাকলো— যেন স্বজনেরও বাড়া, যেন আমি
নিজেই এসেছি খোলা জখমের অজেয় জীবন
হাতে করে : একটু জায়গা দাও, ঐ শানের একপাশে
একটি রাত্রির সুখে জিতে নেব অসীম প্রমায়ু
—বলে আমি নিজেকেই শত্রু মেনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—

দিয়েছ হত্যার অস্ত্র হাতে তুলে, সেই অধিকারে
মুড়িয়ে নিয়েছি সব আভরণ রাত্রির গা থেকে।
আমি চোখে দেখতে পাই নে, শুধু হৃৎপিণ্ডে আঁধার
বেজে যায়! আমাদের গ্রাম জ্বলে গেছে, আমাদের
সব শস্য লুটে নিয়ে গেছে এক অজানা ফেরারী!
তারপর, হে পাথুরে স্রষ্টা, তুমি দীর্ণ পাথরের
রন্ধ্র উচ্ছ্বসিত করে শতোৎসার ইচ্ছের ফোয়ারা
হয়ে উঠে এলে : সব পুরোনো মানুষদের ভূত
পথে পথে ঘোরে, সারা রাস্তা জুড়ে অবাধ মস্করা
লিখে যেতে থাকে : 'তুমি কোন গাঁ-র ?'—প্রশ্ন করে শুধু
হাতে হাতে ফিরে পাই এক ফালি তুলোট কাগজের
উচ্চারণ : 'আমরা বৃষ্টির রাতে চাঁদের আলোর
গল্প বুনে হারিয়ে গিয়েছি সেই বৃষ্টিরই ভিতরে
একদিন। আজ উঠে এলাম তোমার ছায়া হয়ে!'

নিটোল স্তনের মতো স্ফীত মেঘ জ্যৈষ্ঠ পার হয়ে
চলে গেছে দিগন্তের কাছাকাছি : সম্বৃত রেখেছে
সমস্ত বর্ষণধারা শুধু তার নিজের ভিতরে।
মাথা নুয়ে আসে : সূর্য এত ভার! কোষে কোষে জ্বলে
দগ্ধ স্মৃতি, হরিয়ালীরিক্ত এক বিশাল বিস্তার।
একদিন আমাদেরও সময়রহিত সবুজাভা
আঙুল ডুবোনো ঘন শ্যাওলার মতন ফলেছিল।
আজ সেই গ্রাম্য কিংবদন্তী—যারা ভেক জানে—ওস্তাদ সাত্বিক—
তাদেরই রাজপাট। তারা আমাদেরও অবারিত কৃপা
দিতে চেয়েছিল, শুধু গরবিনী পুণ্যার্থিণীদের
পুজোর স্তূপের মধ্যে আমরা বিলীন হয়ে গেছি!
মিনতি করি নে : 'ডাকো, আমাদেরও একবার ডাকো!'
আমাদের ডেকে গেছে অগ্নিগর্ভ মেঘ! সেই ডাকে
শুধু দগ্ধ হয়ে যাবো বলে আজও জীয়ন্ত রয়েছি।